সপ্তম অধ্যায়

রঙ্গব্যঙ্গ ॥

১.

বাংলা সাহিত্যে হাস্যপরিহাস রসিকতার অভাব নাই। অবশ্য বাঙালী জাতির চরিত্রে হাসির চেয়ে কান্নার মাত্রাই অধিক - এরকম একটা দুর্নাম প্রচলিত আছে। তবু মধ্যযুগের সাহিত্যে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের রচনায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণে হাস্যরসের উৎসার লক্ষ করা গেছে। এ হাসি অধিকাংশ সময়ই কিঞ্চিৎ স্থূল। তবে মুকুন্দচক্রবর্তীর ভাঁড়ুদত্ত স্থূলতার আচরণে কবির প্রখর সমাজবোধকে ব্যক্ত করছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় কৌতুক রঙ্গব্যঙ্গ যথেষ্ট। আধুনিককালে এই রঙ্গব্যঙ্গ-এর ধারাটি বেশ প্রশস্ত এবং পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে প্রায় প্রত্যেক সমাজ সচেতন লেখকই এই হাস্যপরিহাসের ধারাটিতে কিছু না কিছু সংযোজন করেছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ হিউমারে যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়েছে এই হাস্যরস-সাহিত্য। একালে বঙ্কিমই প্রথম উজ্জ্বল হাস্যরস নিয়ে এসেছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকারদের রচনায় তার পরিপুষ্টি ঘটেছে। কালিদাস রায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। রঙ্গব্যঙ্গের ধারাটিও তাঁর হাতে বেশ খুলেছে।

কালিদাস রায়ের সাহিত্য রচনার মূল প্রসঙ্গে কিন্তু হাস্য পরিহাসের ধারা নয়। কঠোর সমাজ-সমালোচনার পরিবর্তে মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং সহৃদয় আচরণ তাঁর রচনায় বেশি। তিনি চোখের জলের ভাষ্যকার নন কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর সহজ হৃদয়বত্তায় আমাদের চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে বেশ কিছু রঙ্গরসের কবিতা পাওয়া গেল। মানুষ হিসেবে কবিশেখর চিরকালই স্বভাব-সংযত গম্ভীর এবং চিন্তাশীল। লঘু চপল তারল্য তাঁর ব্যবহারে কেউ আশা করে না। কিন্তু মার্জিত হাস্য পরিহাসে তাঁর সহজ দক্ষতা ছিল। সামাজিক ভন্ডামি দেখে তিনি বিরক্ত হতেন, ন্যাকামি দাম্ভিকতা বা শঠতা দেখে বিরক্ত এবং দুঃখিত হতেন। কিন্তু মনকে যথাসম্ভব রোষ বা ক্ষোভ থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন। তাঁর সমসাময়িক কবি মোহিতলালের এ সংযম ছিলনা। কোন অন্যায় দেখলে তিনি

ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। কালিদাস তেমন ছিলেন না তিনি রোষকে রসে পরিণত করবার চেষ্টা করতেন।[১] ফলে ক্ষোভ বা রোষের কারণ ঘটলেও তিনি বহুক্ষেত্রে মনকে প্রসন্ন রাখতে পারতেন। তাঁর মুখেও সরস রসিকতা অনেকে শুনেছেন।[২] এই কারণে তাঁর রঙ্গরসের কবিতাগুলিতে আঘাতের জ্বালা নেই, তা মৃদু পরিহাসে পরিণত হয়েছিল।

হাসির লেখকেরা মূলত দুটি শ্রেণীতে পড়েন। একদল নিজেদের গৌরব বোধের দ্বারা অন্যকে তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে হাস্য উৎপাদন করেন, আর আরেকদল অসঙ্গতিবাদের তত্ত্বকে বড় করে দেখান। অর্থাৎ অন্যের চারিত্রিক মানসিক ও ক্রিয়াজনিত অসঙ্গতিই হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আবার এরা উভয়েই মূলত চারটি শ্রেণীর হাসির প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাফেরা করেন। হিউমার, উইট, স্যাটায়ার, ফান - এই চার প্রকৃতির হাসির মধ্যে রসিকেরা হিউমারকেই বেশি মূল্য দেন। কেননা এর মধ্যে আছে হাসি আর কান্নার এমন এক সামঞ্জস্য যা আমাদের মনকে দ্রবীভূত করে এবং চিত্তের প্রসন্ন হাসিকে বাইরে বের করে আনে। উনিশ শতকের যে সমস্ত নক্সাকারেরা বাবুদের বাড়াবাড়ি নিয়ে কিছু লিখেছেন তাদের মনে আত্মগৌরববাদ প্রবল। তাঁরা এই সহানুভূতিপূর্ণ হিউমারের বদলে বরং স্যাটায়ারের দিকে ঝুঁকেছেন। স্যাটায়ার সমাজ সংশোধনমূলক রচনা। এজন্য যেকালে সমাজে বিকৃতি প্রবল হয় সে সময় স্যাটায়ার ধর্মী রচনার সংখ্যা বাড়ে। তার সঙ্গে উইট এসে যোগ দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যে এই আত্মগৌরববাদ প্রবল। উইট আর স্যাটায়ার সেখানকার মূল প্রকৃতি। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকহাস্যগুলিতে অসঙ্গতিমূলক রঙ্গরস মুখ্য। তবে অনেক সময় এই হাস্যরসের রচনাগুলিতে আত্মগৌরববাদ আর অসঙ্গতিবাদ এমন ভাবে মিশে যায় যে তাদের পৃথক করা যায় না। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রধানত রঙ্গরসের রচনায় সিদ্ধহস্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'উদ্ভট অবস্থাবিপর্যয়, অতিরঞ্জিত পরিস্থিতি এবং অতিশায়িত চরিত্রায়ণের'[৩] দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তাতে ব্যঙ্গের ঝাঁঝও ছিল। বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিতে তিনি হাসির সঙ্গে আঘাতের জ্বালাও মিশিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রানুসারীদের

মধ্যে সজনীকান্তের রচনায় ছিল নিপুণ ব্যঙ্গের হাসি। আর সত্যেন্দ্রনাথের পরে হাস্যরসের রচনায় কবিশেখর কালিদাস রায়ই ছিলেন বিশিষ্ট।

২.

কালিদাস রায়ের হাস্যরসের কবিতাগুলি প্রধানত তাঁর 'রসকদম্ব' এবং 'দন্তরুচি কৌমুদী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আর তাঁর পূর্ণাহুতি কাব্যগ্রন্থে ইতর প্রাণীদের বিষয়ে লেখা কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গ রসের কিছু দৃষ্টান্ত আছে। 'কাঁটা ফুলের গুচ্ছ' গ্রন্থে কিছু দ্বিপদী বা চৌপদী কবিতায় তিনি আধুনিক জীবনের অঙ্গ সংহতির অভাব থেকে হাসির কণিকা বিচ্ছুরণ করেছেন। 'রসকদম্ব' কাব্যের ভূমিকায় কবি নিজের হাসির কবিতাগুলির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন -

> সামাজিক জীবনের বহু প্রকার কাপট্য ইতরতা নীচতা ও আত্মম্ভরিতা লক্ষ করিলে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যায় না। অপ্রসন্ন চিত্তে অবিমিশ্র রঙ্গরসের উন্মেষ হয় না। তাই প্রৌঢ় বয়সের রচনায় রঙ্গরস ব্যঙ্গরসে পরিণত হয়েছে।

কবি সাহিত্যের দিক থেকে একে উপকারী মনে করেননি।

কবিশেখরের হাস্যরসাত্মক রচনাগুলিকে মোটের উপর রঙ্গ এবং ব্যঙ্গ এই দুই শ্রেণীতে সাজিয়ে দেখা যায়। রঙ্গ-রসাত্মক রচনাগুলিতে তিনি মূলত সমাজ জীবনের অসঙ্গতিকে কাজে লাগিয়েছেন। আবার সামাজিক কাপট্য দেখে যখন ধৈর্য রক্ষা করতে পারেননি চিত্তের প্রসন্নতা যখন কুণ্ঠিত হয়েছে তখন তাঁর হাস্য পরিহাসের রচনাগুলি ব্যঙ্গের মাত্রা পেয়েছে। তখন wit আর satire জমেছে তাঁর লেখায়। তবে তাও যথেষ্ট জ্বালাময় নয়।

৩.

কবিশেখরের রঙ্গরচনাগুলি মূলত অসঙ্গতি নির্ভর। প্রাত্যহিক জীবনের নানা ছোট খাট অসঙ্গতি জীবনের সামান্য ত্রুটি। ভাষার বিপর্যয়, খাদ্যবস্তুর উপভোগ্যতা নিয়ে কবিশেখরের রঙ্গরচনাগুলি

জমে উঠেছে। মানুষের আত্মম্ভরিতা অন্তঃসারশূন্যতা দম্ভ, বাগাড়ম্বর এসবও তাঁর হাস্য-পরিহাস রসের উপাদান। কখনো এগুলি নিয়ে স্নিগ্ধ পরিহাস রসিকতা আর কখনো মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে ব্যঙ্গ জমিয়ে তুলতে তিনি কসুর করেননি। মানুষ তার নিজের ভাষা সম্বন্ধে খুব স্পর্শকাতর। সে নিজে যেমন কথার ভুল ধরলে ক্ষুণ্ন হয় তেমনি ভুল কথাকে শুদ্ধ করে ব্যবহার করতে চায়। আর তাতেই তার কথার ভুল কখনো কখনো বেড়ে যায়। কথাকে অকারণ শুদ্ধ করবার প্রবণতা সাধু করবার প্রবণতাও এই জন্যে দায়ী। 'শুদ্ধকথা' কবিতার বিষয়বস্তু এই কথাকে শুদ্ধ করে বলবার প্রবণতা। আর তাতে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যা কথা শুদ্ধ করবার পরিবর্তে তাকে হাস্যকর করে তুলছে -

শুদ্ধ করে কথা বলার আমার সদাই চেষ্টা,
আমি বলি কৃষ্টপ্রসাদ লোকে বলে কেষ্টা।
মাছেরে তাই কহি মচ্ছ কাছারে তাই বলি কচ্ছ
কোটেরে তাই কোষ্ট কহি পিপাসারে তেষ্টা।[৪]

কোট তো ইংরেজি শব্দ তাকেও পুরানো রূপে ফিরিয়ে নেওয়া কৌতুকের। এই ভাবে -

আমেরে কই আম্র যেমন জামেরে কই জাম্র,
তামায় যেমন তাম্র কহি মামায় কহি মাম্র।
পাঠশালাকে পটশ্যালক আটচালাকে অষ্টচালক
কম্বলে কই অল্পশক্তি ভেবে ভেবে শেষটা।

পাঠশালাকে পটশ্যালক বলা আটচালাকে অষ্টচালক বলা কিংবা কম্বলকে কমবল অর্থে অল্পশক্তি বলাটা মারাত্মক। তেমনি আলুকে অলাবু বলাটাও শব্দ শুদ্ধ করতে গিয়ে অর্থের বিপর্যয় ঘটানো। এভাবে ভাষাকে শুদ্ধ করাটা অর্থহীন।

'নেশাখোরের অভিধান' এরকম ভাষা নির্ভর রঙ্গ কবিতা -

গাঁজা খেলে গেঁজেল যদি মদ খেলে হয় মাতাল

নস্যি নিলে 'নেসেল' তবে - চা খোরেরা 'চাতাল'

ফুরুক্‌ফুরুক্ গুড়ুক তবে টানলে পরে 'গুরখা' হবে

চুরুট খেলে 'চোরঠা' বুঝি গুলি খেলে 'গুলাল্ল'।[৫]

এইভাবে শব্দ তৈরি - এ কবিতায় রঙ্গরসের বিষয় হয়ে উঠেছে।-

'পাগলা নাচে' সামগ্রিক ভাবে বাংলা ভাষার উপরে অত্যাচারের প্রতি কবির কটাক্ষ। একটা সময় বাংলা ভাষায় নানা নূতন experiment করতে গিয়ে তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটানো হচ্ছিল। বাংলা ভাষা ব্যবহারেও যে বিভ্রাট একেবারে উন্মাদের নৃত্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে এ কবিতায় তাই কবির কটাক্ষের বিষয়। ব্যঙ্গের দূর লক্ষ কিছু থাকলেও তাকে স্পষ্টত চেনা যায় না।

পাগলা নাচে তাধেই তাধেই আগলা রে তোর বাংলা ভাষা।

আর না বাঁচে তলিয়ে গেল তোদের গরব তোদের আশা।

কাব্যে নাচে নাট্যে নাচে গল্পে নাচে পাঠে নাচে

অর্থাৎ পাঠ্য বইয়েও নাচে - নটরাজের নৃত্য খাস।[৬]

নবীন লেখকেরা বাংলা ভাষার যে রকম ব্যবহার করছিলেন সজনীকান্তের নেতৃত্বে শনিবারের চিঠিতে তার নানা সমালোচনা হয়েছিল। এখানে কবিও বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ দেখে রঙ্গ-ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। 'নস্যের গান' কবিতার বিষয় ঠিক ভাষা নয় নস্য নেবার ফলে উচ্চারণের বিভ্রাট কোথায় গিয়ে পৌঁছায় তাই তুলে ধরা হয়েছে। নস্য নিলে নাসিক্যবর্ণ উচ্চারণ করা যায় না।

লস্য লিয়ে লিয়ে লাকের সগ্‌গা লাহিরে ভাইরে

ভরভরে এই লাকে আমার গন্ধ নাহি পাইরে।[৭]

নস্যগ্রহণকারী নানা সমস্যা একবিতার রসিকতার বিষয়।

খাদ্যবস্তুর উপভোগ্যতার কৌতুককর বিচরণ ভোজনরসিকের রসনালোভর বর্ণনা আবার খাদ্যলোলুপের কাছে খাদ্যবস্তুর তুচ্ছার্থকতা জনিত অসঙ্গতি সবই রঙ্গ রসিকতার বিষয় হয়ে পড়ে। কবি-মুকুন্দ কালকেতুর ভোজন বিলাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই রঙ্গকৌতুক করবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। নিচের গানটিতে রবীন্দ্রনাথের খাদ্য নিয়ে রসিকতার মধ্যেও পাশ্চাত্য সংস্কার গ্রহণের দিকে কটাক্ষ আছে -

কত কাল রবে বল ভারতরে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন-চুটকি নিয়া
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া।।[৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি কবিতায় খাদ্য নিয়ে রঙ্গকৌতুক করা হয়েছে সন্দেশ নিয়ে লেখা একটি কবিতায় কবির খেদোক্তি- -

আহা ক্ষীর হত যদি ভারত-জলধি
ছানা হত যদি হিমালয়
আহা পরিতাম কিছু করে নিতে কিছু
সুবিধা হয়ত মহাশয়
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুনগুনিয়া
আহা ময়রা-দোকানে যাছি হয়ে যদি
কি মজারি হত দুনিয়া,[৯]

কবিশেখরের 'ভোজরাজ,' 'মিঠাইসুন্দরি,' 'সুরা' ইত্যাদি কবিতায় এই খাদ্যরসিকতাকে অবলম্বন করে রঙ্গকৌতুক করা হয়েছে। 'ভোজরাজ' কবিতাটিতে কতকটা নতুন অর্থে পুরানো শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভোজ ছিলেন রাজা। কিন্তু ভোজরাজ শব্দ দুটিকে একসঙ্গে উচ্চারণ করে বা সমাস করে কবি ভোজনের রাজা অর্থে ব্যবহার করলেন।

ফিরে এস ভোজরাজ পেট ভ'রে ভোজ খাই
প্রজা যদি হতে হয় তোমারই হইতে চাই
দিয়ে - চারিপাশে দধিধারা ঘৃত-ক্ষীর-নদী-ধারা
রচ 'ধারা' নগরীটি রাজধানী হোক তাই।[১০]

'ধারা' ছিল প্রাচীন ভারতের একটি নগরী। কবি ঘৃত ক্ষীর দধি ধারা দিয়ে 'ধারা' নগরী রচনা করতে বলে এই খাদ্য লোলুপতাকে রঙ্গে বিষয়বস্তু করেছেন।- তারপর -

সরোবর রচ তুমি দিয়ে পানা শরবৎ
ছানা বড়া দিয়ে রচ' নানা নব পর্বত
মিহিদানা রাজভোগে রচ' তব রাজপথ
রচ'-তরমুজ রসে হ্রদ রাবড়ীর রচ' নদ
লুচি দিয়ে সাঁকো বাঁধো তারপর আসি যাই।[১১]

'মিঠাই সুন্দরি' কবিতায় মিঠাই-এর প্রতি কবির অত্যাসক্তি-র কৌতুককর বর্ণনা হাস্যরসের বিষয় -

তোরে হেরি মন মজিয়াছে শোন মোদক-দুহিতা সুন্দরী
পান্তুয়া ঠোঁটে রস পিইবারে রসনা উঠিছে গুঞ্জরি
আম সন্দেশ কালজাম দিয়ে
কে রচিল তব আঁখি যুগ প্রিয়ে
রচা তালশাঁসে চিবুক শোভে সে ফলারিয়া প্রাণ মনহরি।[১২]

কবি মিষ্টান্নগুলির যথাস্থানে সন্নিবেশের দ্বারা মিঠাই সুন্দরির রূপমূর্তি রচনা করেছেন। এটিই কবিতার কৌতুকের বিষয়।

'ঘৃতং পিবেৎ' কবিতায় এই ভোজন রসিকতার কথা কৌতুকের বিষয় হয়েছে।

'ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' বর্জ করেও ঘি খাওয়া চাই
চার্বাকের ঐ চর্বিতচর্ব লিখে গেছে ঠিক কথাটাই
এ ঋণ কিছু শুধতে না হয় ঘৃতে হয় বল উপচয়
(তাই) ঘৃত ভুকে চাইতে টাকা পাওনাদারের সাধ্য কি ভাই ?[১৩]

ঋণ করে শুধু নয় চুরি করেও ঘি খাওয়া চলতে পারে -

ঋণ কেন কই ? - ঘৃতননী চুরি করাও চলতে পারে
সাক্ষ্য ইহার মানতে পারি বৃন্দাবনের পুরাণকারে।[১৪]

কবি বলছেন যজ্ঞে ঘি না পুড়িয়ে খেলে শরীরে বল হত আর তাতে 'হীন হত না দেশের দশা হতো নাক যাবতে যশা'[১৫]। কবি কথাটিকে অত্যুক্তিতে পরিণত করে এখানে রসিকতার বিষয় করে তুলেছেন।

কতকগুলি কবিতায় কবি তাঁর প্রিয় বস্তুর প্রতি অতিশয় মমত্ব প্রকাশ করে কৌতুক রস জমিয়ে তুলেছেন। এই বস্তুগুলির আপাতঘ্যতা এবং কবির সেগুলির প্রতি অত্যাসক্তি এইসব কবিতার রঙের মূল। যেমন 'ছত্রবিয়োগ' কবিতার বিষয় পুরানো ছাতা হারিয়ে ফেলার ফলে কবির শোকাতিশয্য -

বর্ষ সাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই[১৬]

কবি মাত্র 'চারটি টাকায়', 'তিনবছর আগে' এ ছাতাটি কিনেছিলেন। তিন বছর ধরে ছাতাটিকে তিনি 'জীবনসঙ্গী' ভেবে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। একে ছড়ি হিসেবে রুমাল হিসেবে ব্যবহার করতেন -

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি তুমিই ছিলে ছড়ি
গ্রীষ্মিকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি

হাত চলে না পিঠে যেথায় চুলকে দিতে তুমি সেথায়
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচির 'পরে চড়ি।[১৭]

কবির কাছে ছাতার নানারকম ব্যবহার্যতা ছিল। তিনি সেই ছাতাটিকে তিন বছর সবরকম-ভাবে ব্যবহার করেছেন। আজ তার জন্য শোকাতিশয্য প্রকাশ করাতে এই কবিতায় কৌতুক রস জমে উঠেছে বিশেষ করে ছাতাকে 'জীবনসঙ্গিনী' বলা ছাতার নানাবিধ কার্যে ব্যবহার করবার কৌতুককর বর্ণনা এই রঙ্গরসিকতার মূল উপাদান।

'দন্তবিয়োগে' কবিতায় দাঁত পড়ে যাবার শোক রসিকতার মূল বিষয়। কবি দন্তযুক্ত মুখের সুখস্মৃতি মনে করে দন্ত-বিয়োগের বেদনাকে আরও কৌতুকময় করে তুলেছেন। তবে এ কবিতায় হাসি আর বেদনা হাত ধরাধরি করে চলেছে। কবির দন্তবিয়োগের বেদনা কবিকে তারও যাবার 'ডাক' শুনিয়ে যায় -

এ মুখ হইতে বিদায় লইছে একে একে দাঁতগুলি
বলে যায় মোরে ডাক পড়িয়াছে একথা যেওনা ভুলি

নড়া দাঁত পড়ে তাহার সঙ্গে দাঁতের বেদনা যায়
হাসিব কিংবা কাঁদিব তাহার হদিশ পাই না হায়।[১৮]

একই সঙ্গে কবি হাসি আর কারুণ্যকে অঙ্গীভূত করে এ কবিতা রচনা করেছেন -

হাসির দিনত গেল ফুরাইয়া হাসি যার উল্লাস
সেত চলে গেল হাসি নিয়ে গেল করে গেল পরিহাস।
দেহের অংশ আগে গেল এ-ত নহে কিছু অদ্ভুত
একে একে দেহ মহাপথ পানে পাঠায় অগ্রদূত
দাঁত চলে গেল তাহার সঙ্গে ঘুচিল দন্তশূল
দেহ চলে গেল তার সাথে হবে সব ব্যথা নির্মূল।[১৯]

'জুতা বদল' কবিতায় এক পাটি জুতা হারানোর অনুস্তি রঙ্গরসের বিষয় হয়েছে। দিলীপ রায়ের গান শুনে ফেরবার সময় জুতো বদলে গেল -

বদলে গেল জুতা অর্থাৎ এক পাট হলো আমার
আর এক পাট রামার শ্যামার কিংবা তাদের মামার।[২০]

কয়েকটি কবিতায় সামাজিক মানুষের আচরণের অসঙ্গতি রঙ্গরসিকতার প্রসঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অন্যমনস্ক মানুষের আচরণ প্রায় সকলের কাছে রসিকতার বিষয়। বিদ্যাসাগরের লাঠিটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকার গল্প সকলের মনে পড়বে। কালিদাস 'অন্যমনস্ক' কবিতায় এই অন্যমনস্কতাকে রসিকতার বিষয় করেছেন -

শ্রীমান মনোমোহনবাবু থাকেন সদাই অন্যমনে।
খেতে চলেন পোয়াল ঘরে শুতে চলেন খুতরো বনে।

মনোমোহনবাবুর নানা অন্যমনস্ক আচরণ শেষ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে স্ত্রীর কাছে -

তবলা ভেবে যেদিন তিনি স্ত্রীয়ের মাথায় মেলেন চাঁটী,
সেদিন নিজের অবস্থাটা হঠাৎ বুঝে নিলেন খাঁটী।[২১]

এর পরে তাঁর অন্যমনস্কতার অবশিষ্ট কিছু ছিলো কিনা কবি বলেননি।

'মাল্যসঙ্কট' কবিতায় সভাপতির গলার মালা নিয়ে কী সংকটই না ঘনিয়ে উঠেছিল। কবি বলছেন -

সভাপতি কেন হইনাক আমি বলি তোমা আজ খুলে
সভাপতি হ'য়ে গিয়েছিনু আমি পাড়াগাঁয়ে এক স্কুলে
সভায় বসিনু ফুলের মালায় ভরিয়া গেল এ গলা
কত বক্তৃতা কত গান হলো পদ্যে যায় কি বলা ?[২২]

তারপর পথে বেরিয়ে হাটতে গিয়ে পড়লেন বিপদে। গলার মালা দেখে এক বুনো ষাঁড় তাড়া করল। 'পালান পালান' শব্দ শুনেও কবি দৌড়তে পারলেন না।

'দেহখানা মোটা খুলে গেল কাছা কাপড় পড়িল নেমে'

যাইহোক সঙ্গীরা 'মালা ফেলে দিন মালা ফেলে দিন করিতেছে চীৎকার' তাই শুনে কবি মালা ফেলে দিলেন আর তখন ষাড় 'মালাটি খাইতে লাগিল মনের সুখে'। সেই থেকে তিনি সভাপতি হন না।

কয়েকটি কবিতা স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক রসিকতার বিষয় হয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে মজা করা বাঙালীর রসিকতার একটি বিশিষ্ট দিক। এখানেও তাই হয়েছে। স্ত্রীকে ভয় করা, তার নির্দেশ ক্রমেনে চলা পুরুষের এসব স্ত্রৈণ আচরণই হাসির বিষয়। চারিত্রিক অসঙ্গতিই এ হাসির মূলে। 'কেরাণীর রাণী' কবিতায় এই বিষয়ই হাসির উপকরণ -

যখন সখন গৃহিনী গরজে বরিষে বকুনি ধারা
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া
রক্তিমা ধরে অধীর রাগে তাহার আনন খানি
সতত কুঠার-পাণি সে-যে গো আমার নিদয়া রাণী।[২৩]

নামে 'কেরাণীর রাণী' হলেও স্ত্রী সম্পর্কে এই রসিকতা সমগ্র বাঙালী জাতির সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেরাণী স্ত্রীর ভ্রুকুটি ত্রাসে সদা কাতর -

আপিসে হোটেলে বাজারে গঞ্জে সকালে বিকালে সাঁঝে
তাহার ভ্রুকুটি ত্রাসে হৃদয়ে আরও সকলি বাজে।
সাহেবেরো তাড়া চেয়ে হায় তারে বড়ই কঠোর জানি
আমার কাঠের খানি সে যে গো আমি তা সদাই টানি।[২৪]

একদিকে যেমন স্ত্রীকে ভয় অন্যদিকে তার নানা ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা রসিকতার বিষয় হয়ে ওঠে। 'নৃত্যকালীর প্রতি ভজহরি' এই শ্রেণীর কবিতা।

ভাগ্যে তুমি সুন্দরী নও প্রিয়ে
তাই কোন রূপে চলছে জীবন তোমাধনে নিয়ে[২৫]

সুন্দরী স্ত্রীর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা যেন অনেক বেশি।

নইলে মাথা ভাঙতে ইটে
খ্যাঙরা আরো পড়ত পিঠে
এই দেহটার গাঁঠে গাঁঠে উঠত ফুটে বিয়ে।

স্ত্রী বিদুষী নয় কিংবা সুকণ্ঠীও নয় সে বিষয়ে কবির কথা :

ভাগ্যে তুমি নও বিদুষী ক-অক্ষর গোরুর মাংস
ভাগ্যে তুমি গান কর না গলাটা যে ভগ্নকাংস্য
তাই পালিয়ে বা'র বাড়িতে
পারি আমি হাঁপ ছাড়িতে
নইলে বনে হতই যেতে লম্বা পাড়ি দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যেকেই স্ত্রীবিষয়ক রসিকতা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত লাইন -

পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো বলে সর্বশাস্ত্রী
কুমীর ধরলে ছাড়ে, তবু ধরলে ছাড়ে নাক স্ত্রী।[২৬]

ঔদরিকতার মতো রন্ধন কুশলতা বাঙালীর রসিকতার আর একটি বিষয়।

কালিদাসের 'গিন্নীররান্না' কবিতায় গৃহিনী রন্ধনে অপটু হাসির বিষয় হয়েছে। গৃহিনীকে ভয় পাওয়ার জন্যে একবিতার মজা আরো জমে উঠেছে।

গিন্নী তোমার কি সুমিষ্ট রান্না
খাওয়াও যাহা আহা আহা রাজাও তাহা খান না
আহা - রেঁধেছ এ ঝোল কি অমুল ?
দিয়ে - রান্না ঘরের সব সমুল

এযে - লোম বাছতে যায় কম্বল
(বড় দুঃখে, উঁহু) আনন্দে পায় কান্না[২৭]

সাজসজ্জার অসঙ্গতি নিয়ে রঙ্গকৌতুক করা হয়েছে 'মদনমোহন' কবিতায়।

শ্রীমান মদনমোহন বাবুর রূপে সবার মন ভুলে
কে রঙালো এ কার্ত্তিকে এমন কালো রঙ গুলে ?
দশগাছি চুল একটি দিকে অন্য ভাগে পাঁচটি রেখে
টেরি তিনি কেটে থাকেন স্নানের পরে টাক চুলে।[২৮]

মদনমোহনবাবুর পোষাকে সজ্জিত চেহারাটি দেখে কবির মনে হয়েছে -

ময়লা যেন তাকিয়াটি রেশমী ওয়াড়ে সজ্জিত[২৯]

সাজসজ্জা নিয়ে কৌতুক ব্যঙ্গের দিকে চলে গেছে 'নব্যবাবু' কবিতায়।

ধন্য তোমার সাধনা, ভাই, সখা আমার - বলিহারি।
অনেকটা ত আগিয়ে গেছ সখীই হবে তাড়াতাড়ি।
লম্বা তোমার চিকন চুলে সীঁথিতে, ভাই, পরাণ ভুলে
একটু সিঁদুর পরে নিও, চাও ত না হয় দিতে পারি।
কোঁচা খুলে শাড়ী(?) খানা নাও দেখি ভাই জড়িয়ে গায়ে
আলতা যদি না পরো ত 'পাম্পশু' জোড়াই থাক না পায়ে।
বদলিয়েছ চাউনি চোখে, ভুল করে চায় পাড়ার লোকে
কথার ঢঙে, ঠোঁটের রঙে আমিই তোমায় চিনতে নারি।[৩০]

কবিশেখরের রঙ্গকৌতুক জমে উঠেছে এই সব ছোটখাটো অসঙ্গতি, বিকৃতি বা আতিশয্যের উপাদানে। আর এই রঙ্গরচনায় তাঁর মনের প্রসন্নতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। পরিহাস ব্যঙ্গের দিকে ঝুঁকেছে কদাচিৎ। বরং অতিরঞ্জিত পরিস্থিতি। আতিশয্যপূর্ণ বর্ণনা এই সব ক্ষেত্রে হাস্যকৌতুকের মজা জমিয়ে তুলেছে।

৪.

এই রঙ্গকৌতুকের মধ্যে লালিকা রচনাগুলির কথা উল্লেখ করা দরকার। লালিকাগুলি একপ্রকার লঘুকৌতুক পূর্ণ রচনা। প্যারডি বা লালিকা রচনার ধারা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীর প্যারডি করেছিলেন। কবিশেখর বলেছিলেন 'প্যারডি একপ্রকারের বাককলা'। প্যারডিতে মূলকবিতার ছন্দ বজায় রেখে ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন করে sublime কেও ridicule করে তোলা হয়। এতে কৌতুক ঘণীভূত হয়ে ওঠে। মূল রচনার প্রতি প্যারডি-কারের কোন অশ্রদ্ধা নেই, তাঁকে বা তাঁর কবিতাকে ব্যঙ্গ করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কবিশেখর বলছেন 'সৎ কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্যারডি রচিত হয় না।' রবীন্দ্রনাথ নিজের গান প্যারডি করেছিলেন। রজনীকান্ত দাসের প্রতিভা এ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর। প্যারডির হাস্যরসকে বাক্‌কলা-সমুত্থিত বলা চলে। এ একপ্রকার wit। প্যারডি সৃষ্টি করতে হলে কবির যে ছন্দজ্ঞান, কাব্যরসবোধ এবং রসনাচাতুর্য চাই তা কবিশেখরের ছিল। তিনি অনেকগুলি রসোত্তীর্ণ প্যারডি রচনা করেছেন। রজনীকান্তের 'কেন বঞ্চিত রব চরণে' গানটির প্যারডি করে তিনি লিখলেন -

কেন-বঞ্চিত হব ভোজনে ?
মোরা - কত আশা করে নিজ বাসা ছেড়ে
খেতে - এসেছি এখানে কজনে।[৩১]

কবিতার বিষয় খাদ্য রসিকতা আর তা জমেছে মূল কবিতার প্যারডিতে। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' গানের প্যারডি কবিশেখরের 'সুরা' কবিতা -

অয়ি - জীবন ধনহারিনী
অয়ি - নির্জলা, - সূর্যকরোজ্জ্বল বরণী
গণিকা-তারিণী-তারিণী[৩২]

কবিশেখর মূল কবিতার ছন্দ এবং ভাষার বৈশিষ্ট্য মনে রেখে একবিতায় ভাষা ব্যবহার করেছেন।

নীল বোতল-তলবাসিনী টলমল
ফেনিল বিকম্পিত মাতাল সমুল
স্তম্ভিতে চুমিয়া কর তুমি চঞ্চল
শুভ্রে ধূসর-কারিনী[৩৩]

'তোমার মুরদ' কবিতাটি রজনীকান্তের " তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে" কবিতার প্যারডি।

তুমি-নির্মল করে চুরমার কর নারীর মর্ম খোঁচায়ে
অন্নবসন দিতে অক্ষম রয়েছ শাসন ওঁচায়ে।
তুমি - লক্ষ্যশূন্য বাক্যবাগীশ ঘুরিয়া বেড়াও পাড়াতে,
জাননা কেমন কত ঠেলা ধন দুইবেলা ভাত বাড়াতে।[৩৪]

রজনীকান্তের গানকে এরকম ridicule করবার জন্য কবিশেখরের সমালোচনা হয়েছিল। তার এরকম আরও কয়েকটি প্যারডি কবিতা আছে।

ঠিক প্যারডি নয় বরং সুকুমার রায়ের কবিতা রচনার ধারা কিছুটা অনুসরণ করে কবিশেখর দুটি কবিতা লিখেছেন। সুকুমার রায় যেমন কথার মজা জমিয়ে তোলেন কথারই নানা ঘার প্যাচে, উদ্ভট রসের সৃজন হয় তাঁর সেই কথার পিঠে কথাতে সেরকম কবিশেখর 'হাসিয়ে দিলে' কবিতায় সুকুমার রায়ের অনুসরণে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। কথাটা বিশেষ কিছু নয় কেবল হাসিয়ে দেওয়া -

বাপরে ওরে, বাপরে ওরে কি হাসিটাই হাসিয়ে দিলে
গেলায় গেলায় তলিয়ে গেলায় হাসির বানে ভাসিয়ে দিলে।[৩৫]

হাসিয়ে দেবার ফলে হাস্যরত মানুষটির হাস্যকর আচরণই এই কবিতার রঙ্গরসের মৌল উপাদান -

চায়ের পেয়ালা ভাঙলো হোঃ-হোঃ চেয়ার হতে পড়ব নাকি
হি, হি, হা, হা হাসতে হাসতে দম আটকে মরব নাকি
উল্টে গিয়ে দোয়াত, হাহা কাপড় জামা ভিজল আহা
আসছে কান্না আর্‌না আর্‌না হাঁচিয়ে দিলে কাসিয়ে দিলে। [৩৬]

আর একটি কবিতা 'অপূর্ব অধ্যাপনা'-

এর মানেটা বুঝলে নাক বুঝলে নাহে অর্থ এর
যা-তা নহে এ বাছাধন! বিদ্যে এতে লাগবে ঢের[৩৭]

অতঃপর কেবল কথার ফুলঝুরি করে গোটা কবিতায় হাসির মজা জমানো হল কিন্তু মানেটা আদৌ পরিস্কার হল না। এই কবিতার মধ্যে অধ্যাপকের আত্মম্ভরিতা এবং অন্তঃসারশূন্যতার দ্বন্দ্বই এর রসের মূল।

আমাদেরই মধ্যে আবার এ কথাটা কজন বুঝে ?
পাবে নাক একটী লোকও দেশটা গোটা এস খুঁজে
গূঢ় অর্থ অনেক আছে, ধৈর্য ধরো বসো কাছে
কি যে তথ্য বুঝিয়ে দিলে তবে তখন পাবে টের

কিন্তু বোঝানো যে অসম্ভব কারণ তিনি নিজেই তো বোঝেননি -

অর্থ কি আর করব ইহার ? এ যে রতন সুদুর্লভ,
এযে রসের পায়েস পিঠে রসিকমনের মহোৎসব

তারপর সেই সুদুর্লভ রসবস্তু অধ্যাপকের শরীরেও নাচন এনে দিয়েছে -

বোঝাব কি ? নাচব আমি - নাচ নাচ বোঝ নিজে

শেষ পর্যন্ত বোঝানই হল না -

কি চমৎকার মরি মরি ! একি লীলা তোমার হরি
ডোবো ডোবো রসের ডোবায় - বোঝান যে অসম্ভব।

এই আশ্চর্য অধ্যাপনা এখানে কবির রঙ্গ ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে।

৫.

ব্যঙ্গের হাসিকে সমালোচকেরা বেশি মূল্য দেননি। করুণ হাস্যরস বা humour এর উপরই তাঁদের শ্রদ্ধা। ব্যঙ্গ মানুষের বড় বেশি সমালোচনা করে। humour মানুষের সঙ্গে একটা সমবেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সহানুভূতির জন্য জীবনের প্রতি অনুকম্পার জন্য humour রসিকদের প্রিয়। ব্যঙ্গরস মনকে আঘাত দিয়ে উজ্জীবিত করতে চায়। এই আঘাত humour -এ নেই। অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন -

> যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করিয়া বিষন্ন করিয়া তোলে যাহা আমাদের মন আমোদে উজ্জ্বল না করিয়া আঘাতে দীর্ণ করিয়া ফেলে তাহা ব্যঙ্গের হাসি।[৩৮]

ব্যঙ্গকার সমাজের শুভাশুভের বিচারক এবং শুভের রক্ষক। এই স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি বড় কঠোর বড় নির্মম। তিনি মানুষের "দোষ ও ব্যাধি নগ্ন করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠেন"[৩৯] এই কাজে ব্যঙ্গকার সমাজের শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি অতিমাত্রায় সমাজ সচেতন। যা ন্যায় ও সত্য বলে তিনি মনে করেন ভ্রষ্ট সমাজকে তিনি সেই ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এজন্য ব্যঙ্গকারের আসন সমালোচনার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তাঁর হাসিতে থাকে আত্মগৌরববাদের ধারণা।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা বিশেষ করে উনিশ শতকের নক্সাগুলিতেই তীব্র হয়ে উঠেছিল। সমাজ যখন কোন প্রবল ভাবনার স্রোতে ভেসে যায় তখন ব্যঙ্গকার সমাজরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। এদিক থেকে তাঁর ভূমিকা রক্ষণশীল। উনিশ শতকের প্রহসনে নক্সায় এবং কিছু কবিতায় এই ব্যঙ্গ রচনার ধারা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রোত্তর কালে সজনীকান্ত দাসের নাম এ বিষয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ব্যঙ্গকে যতই নিম্নশ্রেণীর রচনা বলা হোক না কেন অনেক বড় বড় লেখক ব্যঙ্গ রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় ব্যঙ্গরচনাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য মনে করতেন না। তবু সচেতন সামাজিক মানুষের মনে সমাজ সম্বন্ধে যে সমালোচনা জাগ্রত হয়ে ওঠে তাঁরও মনে সে রকম

হয়েছিল। তাই তাঁর "প্রৌঢ় বয়সের রচনায় রঙ্গরস ব্যঙ্গরসে পরিণত" হয়েছে। তিনি সেগুলিকে কবিতার আকারে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কবি বলেছেন -

> ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে আমি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করি নাই শ্রেণী বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা কিছু ভুয়ো ভাঁওতা মেকি ও ভন্ডামি এই রচনাগুলির অভিযান তাহারই বিরুদ্ধে।[৪০]

সব ব্যঙ্গরচনাকারই সমাজের ভাঁওতা ও ভন্ডামির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে তাঁদের যুদ্ধ আপাত আক্রমনহীনতার মোড়কে ঢাকা থাকে। আর একাজে তিনি তার শব্দশক্তিকে যতখানি সম্ভব তীক্ষ্ণ ও সতর্ক করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি এক্ষেত্রে শব্দের বিশেষ বাছ বিচার না করে তাকে বরং শক্তিমান করে তোলেন।

কবিশেখরের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে অবশ্য শব্দের তীক্ষ্ণ প্রয়োগ তেমন নেই আর প্রাত্যহিক সমাজের অতিশয় স্পর্শকাতর বিষয়ের সমালোচনাও তিনি বিশেষ করেননি। তার ফলে তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা কম জ্বালাও কম। এখানে একটু পরিচয় দি।

মানুষের অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতা সব সময় ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবিশেখরের 'বিদ্যার জাহাজ' এ বিষয়ে একটি সুন্দর কবিতা -

> ইংরাজী আমি জানি না বলে কি জানিনা কিছুই আর ?
> রয়েছে বাংলা সমোসকৃতে যে ঢের মোর অধিকার
> তোমাদের এই কালিদাস কবি
> পড়িয়া ফেলেছি তার পুঁথি সবি
> বেণী-সম্ভব-রঘুসংহার-মেঘদূত-বধ তার।[৪১]

তারপর -

মঘরাক্ষস নাটক লিখেছে ভবরুচি কবি আহা
ভাষ্যসমেত পড়িয়া ফেলেছি কতবার আমি তাহা
সাংখ্যের স্মৃতি পাণিনির গীতা
মনুসংহিতা - হণুসংহিতা
দশম অঙ্ক মহাভাগবত নিঙাড়ি নিয়েছি সার

পান্ডিত্যের ভার বেড়েছে বাল্মীকির পনর কান্ড মহাভারত আর 'বিংশ পর্ব ব্যাস রামায়ণ' পড়ে। এ কবিতায় কবি ও কাব্যগ্রন্থের নামগুলির বিভ্রাট করে কবি ব্যঙ্গের মজা জমিয়ে তুলেছেন। এ ব্যঙ্গের লক্ষ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ হলেও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আক্রমণের আঘাত গিয়ে পড়ে না। যারা এর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে তাদের প্রতিই কবির লক্ষ্য থাকে।

এই দাম্ভিকতা স্পষ্টত ব্যঙ্গের বিষয় হয় 'দম্ভের অপবাদ' কবিতায়। দাম্ভিকের নম্রতার দম্ভ তীব্র হয়ে ব্যঙ্গের হাসিকে উজ্জ্বল করেছে। এই জিনিস দেখতে পাই 'নিজের কথা' কবিতায় -

নিজের কথা ফলাও করে বলাও জেন একটা দোষ
আপন কথা একটি দিনও বলেছে এই নন্দ ঘোষ ?
এই যে আমার একটি ছেলে
এম-এ ল'-এ বৃত্তি পেলে
বলিছে কি কন্যা নিয়ে সাধছে হাকিম চন্দ্র বোস ?

ইংরাজী মোর শুনে জজে কি বলে তা বলিছি কি ?
টের পেয়েছ আমার যত গুপ্ত দানের সিকির সিকি ?
জান কি দূর আত্মীয়ারা
নিচ্ছে কত মাসোহারা
দিয়েছি কি জানতে আমি জীবন্ত যে বিশ্বকোষ ?[৪২]

'মুরুব্বি' কবিতায় এই আত্মম্ভরিতা ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে।

একটি কবিতায় কবি ফাঁপা অতীত গৌরবকে বিদ্রূপের বিষয় করেছেন। আমাদের প্রাচীন সব কিছুই ভালো সব কিছুই গৌরবময় - এই ধারণাকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সবই ছিল - সবই ছিল
গুরু বলে মানছ যাদের নূতন তারা কি আর দিল ?
রেল ইস্টিমার টেলিগ্র্যাফী ছিল ছিল ভারতব্যাপী
ছিল মোদের ফটোগ্র্যাফী ছাপাখানা পেপার মিলও।[৪৩]

এর সঙ্গে এরোপ্লেন টর্পেডো কি ডুবো জাহাজ কল্পতরু এবং হাজার হাজার পরশমণিও ছিল।

এরোপ্লেন ত ছিলই মোদের, নয়ক শুধু শূন্যে ওড়া।
চলত লড়াই মেঘেতে ভাই রথের সঙ্গে উড়ত ঘোড়া।

কল্পতরু প্রসঙ্গে -

কল্পতরু ছিল হাজার, পরশমণি ঝুড়ি ঝুড়ি
গণ্ডূষে পান করত সাগর আসত যেত পাতাল ফুঁড়ি।

কতকগুলি কবিতায় কবিখ্যাতি এবং কাব্যসমালোচনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'কবিখ্যাতি' কবিতায় সঙের ছড়া, আশীর্বাদী, বিদায় সম্বর্ধনার কবিতা বিয়ের পদ্য লিখে কবি খ্যাতিতে রচয়িতা স্বয়ং মুগ্ধ -

সার্থক আমার কলমধরা দশের স্নেহের-বাণীর সেবা।[৪৪]

'আদর্শ সমালোচনা' অভিমত, আদর্শ সমালোচনা, কঠোর সমালোচনা, তারিফ কাব্য সমালোচনার নানা রকমফের। এই সমালোচনাই ব্যঙ্গের লক্ষ্য। সমালোচনা নামে কখনও বই না পড়ে কিছু বলা কখনো যাকে প্রমথ চৌধুরী 'মলাট সমালোচনা' বলেছিলেন তাই করা - এই হল রেওয়াজ। কবির 'আদর্শ সমালোচনা' নামক দুটি কবিতা আছে। প্রথমটি না পড়ে লেখা সমালোচনার প্রতি, দ্বিতীয়টিও না পড়ে কিন্তু কেবল দেখে সমালোচনা করার প্রতি ব্যঙ্গ।

বইখানা ভাই পেয়ে তোমার পড়ে ফেললাম আগাগোড়া[৪৫]

বইটি বেশ 'সুরচিত'। কিন্তু তারপরই প্রথম ধাক্কা 'পাতাগুলা কাটাত নাই' এবং দ্বিতীয় ও মোক্ষম ধাক্কা শেষ স্তবকে -

বইটা পড়ে লাগল কেমন জানতে তুমি চেয়েছিলে
ভূমিকাতে যা লিখেছে তার সাথে মোর মতটি মিলে
কি বলিলে ? ভূমিকা নাই ? ও তা হবে। সেই কথাটাই
লিখত যদি ভূমিকাকেউ নিশ্চয়ইত লিখত ওরা।

অর্থাৎ সমালোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু অন্তঃসার শূন্য বাগাড়ম্বর। এবার দ্বিতীয় 'আদর্শ সমালোচনা' থেকে উদ্ধৃত করি। এটি রূপাত্মক সমালোচনা -

কাব্যের নাম 'আশার স্বপন' প্রকাশক পি-গুপ্ত, ঢাকা।
লেখক শ্রীযোগজীবন বসু মূল্য ইহার দেড়টি টাকা
মলাটে তিনবর্ণ ছবি ছেপেছেন যোগজীবন কবি
দেখে যেন হচ্ছে মনে পূর্ণ কিংবা ফণীর আঁকা।[৪৬]

শেষ পর্যন্ত আদর্শ সমালোচনা ছাপার সৌন্দর্য স্বীকার করে বাঁধাই পর্যন্ত গিয়ে পড়ল -

বাঁধাই ভাল দেখছি ঢাকার কম নেবে না ষোল টাকার
সেলাই দেখে মনে হচ্ছে দস্তরীটি খুবই পাকা।

'কঠোর সমালোচনা'ও একই রীতির কবিতা। ছাপা ও বাঁধাই-এর সমালোচনা -

ঝকঝকে এর ছাপা, কাগজ যেমন পুরু তেমনি সাদা,
খাস বিলিতি বাঁধাই যেন - তারিফ করি ইহার বাঁধা।[৪৭]

শেষ পর্যন্ত 'কঠোর সমালোচনা' গিয়ে পৌঁচেছে যেখানে সে হল -

প্রতি পাতায় বারো লাইন বেশ করেছ ছেপেছ ভাই
চারিপাশে অনেক ফাঁকা চোখ জুড়াবার জায়গাত চাই

ঐ বারো ছত্তরের মায়া কাটাতে পারলে না ভায়া
ঐ মায়া কাটালে হত বই এর কায়া অবিকৃত।

অর্থাৎ বইয়ের পাতায় বারো ছত্রের ছাপা লেখা না রাখলেই বই ভালো হত(!) এসব কবিতায় কবি সমালোচনার নামে যা হয় তার চিত্র কিছুটা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন। হাসির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন কর্ম আর তা সম্পাদনের অসঙ্গতি।

ভাষা নিয়ে রঙ্গকৌতুকের কথা আগে বলা হয়েছে। বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি হিন্দী বা অন্য ভাষার মিশ্রণ নিয়ে অনেক কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লোকরহস্য-এ ইংরেজি বুকনির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মধুসূদন তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন-এ এরকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরাজী মিশ্রণ দিয়ে দ্বিজেন্দ্র লাল reformed Hindoos কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হসন্তিকার 'জবান পঁচিশী' কবিতায় অনেকগুলি ভাষা মিশিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবিশেখরের 'অবিমিশ্র ভাষা' এই শ্রেণীর কবিতা। কবিশেখরের কবিতার হাসি অনেক সময়ই কথা আর কাজের বৈপরীত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এখানেও তাই হয়েছে।

খিঁচুড়ি ভাষায় কথা বলা আমি লাইক করি না মোটে
বিদেশী ওয়ার্ড ইভেড করিতে সংযম চাই ঠোঁটে
এ মাদার টাং জানিও ইওর
ভোকাবুলারিতে নয়ক পুওর
পরের হেলপে হায় কেন সেন করিবে পরের বোটে।[৪৮]

কবিতাটির অধিকাংশ শব্দই ইংরেজি। কর্তা বলছেন -

এমনি করিয়া লুজ করিতেছি ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজ

তাঁর আবার দেশাত্মচেতনা প্রবল -

যে ভাষাতে বেস্ট পোয়েট্রি লিখিল মধু রবীন্দ্র হেম,
সে ভাষায় কথা বলিতে পার না ফাই ফাই শেম শেম।
সে ল্যাংগোয়েজ নয়ক উইক
কালচার নাই, আরে ধিক ধিক
হোম-টপিকেও কমন টকেও ওয়ার্ড নাহিক জোটে ?

ভাষা ব্যবহারের ঘোষনা আর প্রয়োগের অসঙ্গতি এখানে কৌতুকের উপজীব্য বিষয়।

অনেকগুলি কবিতায় কার্পণ্য, দানের গৌরব বা দাতৃত্ব সমালোচনার বিষয় হয়েছে। 'বদান্যতা' কবিতায় সংসারের সমস্ত খরচই মহাশয়ের মনে দান হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে -

যাহা কিছু কামাই সবি চ্যারিটিতেই যায়
দানের পুণ্য ছাড়া আমার কিছুই নাহি হায়।[৪৯]

'ভায়ের মায়ের' (কেননা মা ভাই-এর কাছে থাকেন) কাশী যাবার সময় এই দাতা দশটি টাকা দিয়ে মহাদানী হয়েছিলেন এত তাঁর বদান্যতা। 'কার্পণ্য' কবিতায় প্রায় এক কিন্তু তার প্রকাশ হচ্ছে বিপরীত দিক থেকে।

কৃপণ আমায় তোমরা বল আমার মত খরচে আছে ?
জান কত যাচ্ছে টাকা উচ্ছে মূলো চিংড়ি মাছে ?

ইনি 'তেজ বরে' মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং এমনই খরুচে যে মাকে এবং স্ত্রীকে খেতেও দেন -

বুড়ো মাকে দিচ্ছি খেতে - একবেলা খান - খানত তিনি
পঁচিশ বছর দুটি বেলা খেয়ে যাচ্ছেন মোর গৃহিনী।[৫০]

এই যে কথার বাড়াবাড়ি, মনোগত অভিপ্রায় আর কর্মের অসঙ্গতি বাগাড়ম্বরতা এ সবই এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ। এরকম অনেক কবিতার মধ্যে 'হিংসার অপবাদ' কবিতাটি একটু উদ্ধৃত করি। এখানে মুখে হিংসা না করবার কথা বলে মনে মনে যারা হিংসা করে তারাই ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে।

হিংসা করিব কেন বল ভাই অন্যের সুখে কি মোর ক্ষতি
'যা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি' বলিয়া গেছেন বৃহস্পতি
বি এ ফার্স্ট হয়ে তোমার ছেলে যে
আবার পড়িছে এম•এল কলেজে
এম•এ ফার্স্ট হয়ে বিলাতেও যাবে যার যা ভাগ্য তার তা গতি[৫১]

দেশ নেতাদের কথা 'জননেতা' কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। একালের কর্ণপীড়ক যন্ত্র 'লাউড স্পিকার' একটি কবিতায় ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। কবি লিখছেন লাউডস্পিকারকে লক্ষ করে :

যা আসেনি অসুরটা এসে ঠিক হয়েছে হাজির,
তাহারি তো পোয়াবারো তারে ঘিরি জমে যত ভিড়।[৫২]

কবি একশ্রেণীর ক্ষুদ্র কবিতায় ব্যঙ্গরস ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে এগুলিকে ঠিক রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা বলা যায় না। এগুলি কিছুটা নীতিমূলক কবিতা। যেমন 'গোরু ও বাছুর' কবিতা -

ছাত্রের উকিল পিতা শিক্ষক বন্ধুরে হেসে কন
তুমি ত চরাও গরু হাতে লয়ে বেতের পাঁচন।
শিক্ষক কহিল হেসে, গোরু চরানোর করি না বড়াই
গোরু চরে আদালতে, তাহাদের বাছুর চরাই।[৫৩]

'পদ গৌরব' নামক আর একটি কবিতায় কবি পদগৌরবকে ব্যঙ্গের বিষয় করেছেন -

ভাগ্যবলে ভিড় ঠেলে উচ্চপদ পাইলে যে দিন
সেদিনই হইলে তুমি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত প্রবীণ
সবার মুরুব্বি হলে সেই হতে তোমার চেয়ার
ছারপোকা রূপে হল সর্বগুণ বিদ্যার আধার।[৫৪]

রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ বা লেখন কাব্যের বিরল পংক্তিগুলির মতো 'কাঁটা ফুলের গুচ্ছ'এ সংকলিত কবিতাগুলির মতো ব্যঙ্গের ঈষতিক্ত রস ফুটেছে ভাল।

'পূর্ণাহুতি' কাব্যের পশুদের নিয়ে লেখা কবিতায় কবি ব্যঙ্গরস ভালোই ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সিংহ' 'বানর প্রশস্তি,' 'ছাগ,' শৃগাল', 'মেষ' ইত্যাদি কবিতাগুলি সামাজিক মানুষের বিভিন্ন অবয়ব মাত্র। এগুলিতে মানুষই কবির লক্ষ্য। মানুষের নিত্যকার চারিত্রিক বিকৃতিতে কবি কতোটা বিচলিত হয়েছিলেন এসব কবিতায় তারই প্রকাশ ঘটেছে। 'বানর প্রশস্তি' কবিতায় কবি বলছেন :

হে নরের বিকলা বানর
বৈজ্ঞানিক বলেছেন বানরের মোরা বংশধর
বিজ্ঞানের দোহাই দেবার
বোধহয় ছিল নাক কোন দরকার
আচরণসাম্যে বুঝিতোমরা যে আমাদের জ্ঞাতি
অতএব পালণীয় রক্ষণীয় তোমাদের জাতি।

কবি বানরদের শিক্ষা এবং ভোটাধিকারও চাইছেন -

শিক্ষা তরে বিদ্যালয় কর সবে দাবি
চাবে ভোটে অধিকার ? দিতে হবে কি হইবে ভাবি ?[৫৫]

এতে আমাদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক গণতন্ত্রের প্রতি কবির কটাক্ষ আছে বলে মনে হয়।

'মেষ' কবিতায় কবি একালের মানুষের গড্ডলিকা দেখে তাকে গুরু হিসেবে উপস্থিত করছেন -

হে গড্ডল, গড্ডলিকা প্রবাহ তোমার
শিখিয়া গিয়াছি মোরা, তুমি গুরু তার॥
ঘরে ঘরে গিন্নী আছে তব রূপ পেতে
হয়নাক আমাদের কামাখ্যায় যেতে।[৫৬]

আমাদের স্ত্রৈণতার প্রতি এবং জ্ঞানাবিবেকহীন ভাবে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার প্রবণতার প্রতি কবির ধিক্কার এখানে ধ্বনিত হয়েছে।

কালিদাস রায়ের রঙ্গব্যঙ্গ রচনাগুলিতে সামাজিক ভণ্ডামি মানুষের আচরণের অসঙ্গতি তার অর্থহীন দম্ভ বারবার সমালোচিত হয়েছে। সমাজের অন্যায় এবং অনৈতিকতা দেখে মানুষের ক্ষুদ্রতা এবং বিবেকহীনতা দেখে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। তাই সব সময় চিত্তের প্রীতি প্রসন্নতা রক্ষা করতে পারেননি। মনে করা যেতে পারে কবির এই ব্যঙ্গরচনাগুলি তাঁর প্রৌঢ় বয়সেরই রচনা। কবি তাঁর প্রথম জীবনে পল্লীর মানুষের সহজ সংসর্গে যে প্রসন্ন রসদৃষ্টি আয়ত্ত করে ছিলেন তাই তাঁর রঙ্গকৌতুক রচনার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। শহরে বসবাস করলেও নাগরিকতার নানা আদব কায়দার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তাদের আচরণের অসাম্য চরিত্রের অসঙ্গতি কথা ও কাজের বৈসাদৃশ্য কবিকে পীড়িত করেছে। মানুষের এই দ্বিচারিতা কোন সামঞ্জস্য তিনি করতে পারেননি। তাই একদিকে যেমন তিনি মনে মনে পল্লীর উদার প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চেয়েছেন তেমনি ব্যঙ্গের কবিতায় সেই জীবনের অসাম্যকে সমালোচনা করেছেন। কবির প্রকৃতিতে সমালোচনার দিকের চেয়ে সহানুভূতির দিকটি অনেক বড় ছিল। তাই মানুষের এই সমালোচনাগুলিও পরে তাকে কুণ্ঠিত করেছে। সে জন্য তিনি মনে করেছেন এগুলি সাহিত্যের পক্ষে কিছু উগ্র হয়ে গেছে। এসব ব্যঙ্গের মধ্যে হয়তো কখনো কখনো তাঁর নিজের প্রতি নির্দিষ্ট কোন মন্তব্যও থেকে যেতে পারে। লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে আমরা চেহারা, বংশ, পদগৌরব এসব দেখি। কবি তাতে দুঃখিত হয়েছেন। হয়তো নিজের মনোকষ্টই এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

চুল হলো তার খোঁচা খোঁচা সে কি কভু লিখতে পারে ?
একে মোটা তাতে কালো কেমনে ক'স লেখক তারে ?
যে জাতেতে জন্ম তাহার সে জাতে হয় লেখক কবে ?
ছেলে পড়ায় স্কুল-কলেজে তারে লেখা পড়তে হবে ?[৫৭]

সূত্রনির্দেশ :

রঙ্গব্যঙ্গ ॥

১. কবিশেখরের কৌতুককাব্য, ড: অমিয় কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শুভশ্রী, পৃ.২৩
২. ঐ
৩. বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৬৭, পৃ.৪২২
৪. রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ.১
৫. ঐ, পৃ.১৬
৬. ঐ, পৃ.৫৪
৭. নস্যের গান, রসকদম্ব, পৃ.৪৬
৮. রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ.৬০২
৯. হাসির গান, দ্বিজেন্দ্ররচনা সংগ্রহ, (১ম খন্ড), সাক্ষরতা প্রকাশনী., পৃ.১৯১
১০. রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ.২৫
১১. ঐ
১২. ঐ, পৃ.৩৩
১৩. ঐ, পৃ.১০
১৪. ঐ
১৫. ঐ
১৬. ঐ, পৃ.১৩
১৭. ঐ
১৮. ঐ, পৃ.১১৭
১৯. ঐ, পৃ.১১৮
২০. ঐ, পৃ.১০২
২১. ঐ, পৃ.৩
২২. ঐ, পৃ.১১৩

২৩• ঐ, পৃ•২৪
২৪• ঐ
২৫• ঐ, পৃ•৪৭
২৬• হাসির গান, দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ(১ম খণ্ড), সাক্ষরতা প্রকাশনী, পৃ•১৯০
২৭• রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ•৩৬
২৮• ঐ, পৃ•১৭
২৯• ঐ,
৩০• ঐ, পৃ•৩০
৩১• ঐ, পৃ•৮
৩২• ঐ, পৃ•৩৪
৩৩• ঐ
৩৪• ঐ, পৃ•৩৫
৩৫• ঐ, পৃ•২৯
৩৬• ঐ
৩৭• ঐ, পৃ•৩১
৩৮• বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিত ঘোষ, ১৯৬৮, পৃ•৪১
৩৯• ঐ
৪০• ভূমিকা, রসকদম্ব, কালিদাস রায়
৪১• রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ•১০
৪২• ঐ, পৃ৬১
৪৩• প্রাচীন গৌরব, রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ•৪০
৪৪• রসকদম্ব, পৃ•১১২
৪৫• ঐ, পৃ•৬০
৪৬• ঐ, পৃ•৭২

৪৭। ঐ, পৃ।৭৩

৪৮। ঐ, পৃ।১১১

৪৯। ঐ, পৃ।১৫

৫০। ঐ, পৃ।৬৩

৫১। ঐ, পৃ।৫৩

৫২। লা উডম্পীকার, দন্তরুচি কৌমুদী, কালিদাস রায়

৫৩। কাঁটাফুলের গুচ্ছ, কালিদাস রায়, পৃ।৮৫

৫৪। ঐ

৫৫। বানর প্রশস্তি, পূর্ণাহুতি, কালিদাস রায়, পৃ।৬১

৫৬। মেষ, ঐ, পৃ।৭০

৫৭। লেম্বকবিচার, রসকদম্ব, কালিদাস রায়, পৃ।১১৯